ওয়াসি আহমেদের গল্পের জগত

দেবাশিস চক্রবর্তী | 15 Jun , 2020

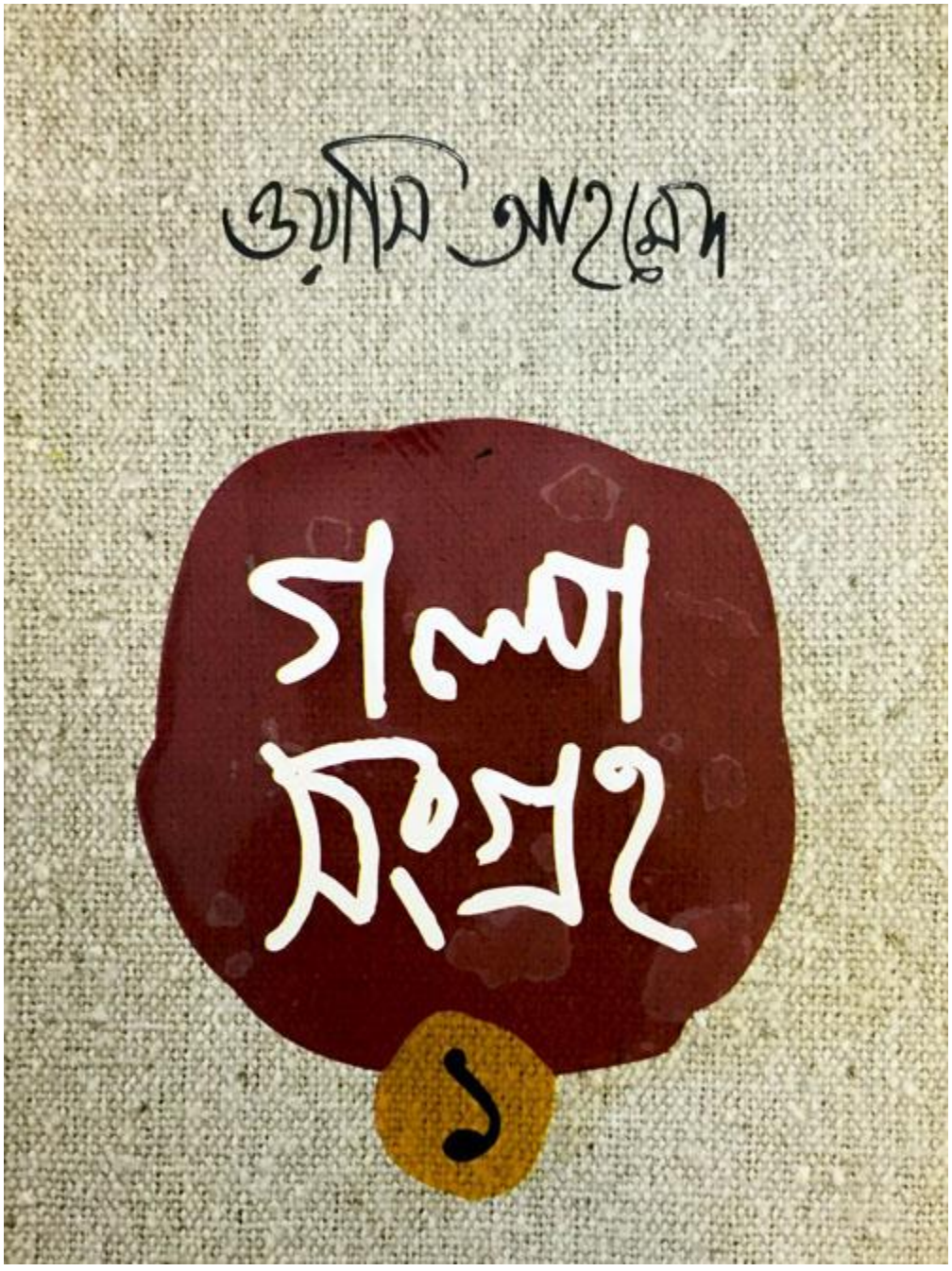

গল্পকার ওয়াসি আহমেদের অর্ধেক জীবন এই গল্প সংগ্রহ-১। আগেই বলে রাখা ভাল, শুধু এই একটি বইয়ের আলোকে গল্পকার ওয়াসি আহমেদকে মানে তার গল্পকে পাঠ করতে গেলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, খণ্ডাংশের পাঠ হবে, কারণ গল্প সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডটা আমলে না নিলে সম্পূর্ণরূপে লেখনীর পালাবদল বুঝা যাবে না বা গল্পের কলকব্জা-বিষয়-আশয়ের ক্রমিক বিবর্তনের চিত্রটা খুব সঙ্গত কারণেই ঠিক ফুটে উঠবে না। তবে খণ্ডাংশের আলোচনার মধ্যে কোন ক্ষতি দেখি না। এই বইয়ে যতটুকু আছে তাতেই দৃষ্টি রেখে, সামগ্রিক 'ওয়াসি আহমেদ' পাঠের দিকে ইঙ্গিত না করে শুধু এই বইয়ের ব্যাপ্তি নিয়ে কিছু আলাপ করা যেতে পারে।

ওয়াসি আহমেদের গল্পগুলোতে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা আছে বাংলাদেশের নিম্নবর্গ-মধ্যবিত্ত মানুষ ও তাদের জীবনের নানা ঘোরফের। তবে, আহমেদ, ইলিয়াসের মতই কোন এক দিকে না ঝুঁকে বরং এক ধরণের টোটালিটির দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার চেষ্টা করে গেছেন গল্পের পর গল্পে। নিম্নবর্গ বলেই ফেরেশতা হবে বিষয়টা এমনটা নয়। তাদের মধ্যেও যে খারপ-ভাল মানবীয় গুণের সমাবেশ ঘটে, তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেছে গল্পগুলোয়। আহমেদও, মধ্যবিত্তকে ঠিক পছন্দ করেননি। গল্পেরচ্ছলে মধ্যবিত্তের হঠকারিতা, অন্তঃসারশূন্যতার দিকে আছে ইঙ্গিত। তার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, গল্প গুলোয় কোন একটা পাটাতনে নানান কিসিমের পরিস্থিতি এক অপরের সাথে মিলে মিশে থাকে, ব্যক্তি তার মধ্যে জর্জরিত অবস্থায় হাশপাশ করে, তিনি তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ তৈরি করার ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকেন। ভাষার জমিনে লুকানো বিস্ফোরকের আভাস থাকে এবং হঠাৎ হঠাৎ কোন কোন বাক্য বিস্ফোরিতও হয়ে যায়। তবে ইলিয়াস থেকে ওয়াসি আহমেদের মোটা দাগে একটা পার্থক্য আছে, সেটা হলো নিষ্পেষিতের মধ্যে তেজের ইঙ্গিত বা ক্ষীণ হলেও ভবিষ্যতের দিকে একধনের বিপ্লবের আশা-এমন কিছুর উপস্থিতি তার গল্পে খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিপ্লবকে তিনি বেশ শ্লেষের চোখে দেখেছেন, অন্তত 'যোদ্ধা', 'চক্রবৃদ্ধি' এবং 'শেরশাহ্ ও তার অমোঘ নিয়তি' গল্পগুলোয় তার নজির পাওয়া যায়। অনেক গল্পেই দেখা গেছে, রাষ্ট্র-সমাজ-প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার নাগপাশ কত বিচিত্র উপায়ে ব্যক্তি মানুষকে আক্রান্ত করে, সমষ্টির মাঝে ব্যক্তি মানুষ আক্রান্ত হয় এবং তার ভেতর বাস্তব-অবাস্তব মিলেমিশে এক জটিল মিথস্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তবে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই যেন অবধারিতভাবে ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে যায়। ব্যক্তির মুক্তি ঘটে মৃত্যুতে। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো অমোঘ মুক্তি, তবে মৃত্যুর আগে মানুষের কি মুক্তির [illegible] চরম অসহায়ত্বের? এটাও কি বাস্তব পরিস্থিতি নয়?

[illegible] মানুষের ঘোর লাগা আবেশ। মানুষ পুঁজিবাদী সমাজে তার শ্রমের বিনিময়ে যে স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করে তার বিপরীতে মানুষের আত্মার যে স্খলন ঘটে, সে যে মানবিক গুণগুলো হারাতে হারাতে এক পর্যায়ে নির্বীজ খোঁজায় পরিণত হয় তার এক ব্যঙ্গাত্মক অথচ করুণ বয়ান এই গল্প।

'বধ্যভূমি'তে চিন্তার একটি বীজ আবেগ-ভয়ের দমকে দমকে একটি কমিউনিটিকে আক্রান্ত করে ফেলে, দেখা দেয় ম্যাস হিস্টিরিয়া। লোভে পড়ে কেউ কেউ এর সুযোগ

নেয় ঠিকই, কিন্তু শেষমেশ নিজেকেও এই হিস্টিরিয়ার কবল থেকে মুক্ত রাখতে পারে না। একদিকে এটা যেমন বাংলাদেশের গণমানুষের জীবন অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য অংশ আবার লাতিন আখ্যানের আবেশে গল্পে প্রকাশিত।

'মেঘসাঁতার' এক বিটকেল গল্প। বাংলাদেশে এমন বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে খুব একটা দেখা যায় না। অফিস-আদালত-কাজে-কর্মে বেশিরভাগ মানুষ মানিয়ে নিয়ে ক্রমে ক্রমে এক ধরণের সাবহিউম্যান জীবন যাপন করা শিখে নেয়। তবে এই বৃত্তের মধ্যে থাকতে থাকতে কিছু মানুষ, সঙ্গত কারণে কোন পুরুষ মানুষের মধ্যে বিচিত্র কিছু অভিব্যক্তির জন্ম নিতে পারে, কেউ কেউ কোন এক অমোঘ নিয়তির বশবর্তী হয়ে ম্যাড়ম্যাড়ে জীবনে পাশবিক জোশের সন্ধান পান। এখন কেন বিশেষ করেই পুরুষমানুষ? কোন বিতর্ক সৃষ্টির তাগিদে নয়। এর ব্যাখ্যা একটু পরেই হাজির করছি। এই গল্পের চাকুরে আর সকলের মতই ছাপোষা-নির্বিবাদী, কোনরকমে জীবনটা যাপন করে আসছিলেন। তবে হঠাৎ অজানা এক ঘোরে আক্রান্ত হন, ব্যাপারটাকে আংজায়েটি অ্যাটাকও বলা চলে। লক্ষ বছরের বিবর্তনের ইতিহাসে পুরুষকে নানা রকমের উত্তেজনাকর কাজ করে আসতে হয়েছে। বিশেষ করে এগ্রিকালচারাল রেভুলুশনের আগ পর্যন্ত তাকে শিকার করতে হয়েছে, বিশেষ করে অল্প কিছু পুরুষ এক সাথে মিলে, দলীয় ভাবে একে অপরের সাথে বিশ্বাস এবং যোগাযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে বন্য প্রাণী শিকার করেছে। এটা ছিল পুরুষের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাছাড়া মানুষকে লড়তে হয়েছে বন্য শিকারি প্রাণীর সাথে, পালাতে হয়েছে প্রাণ নিয়ে। তো বিবর্তনের হিসেবে তার ডিএনএ-তে কিছু কোড লেখা হয়ে গেছে এবং তা লেখা হয়েছে লক্ষ্য বছরের সময়ের ব্যপ্তি নিয়েই। শিকারের আড্রেনেলিন রাস, শিকারি প্রাণী থেকে বাঁচবার জন্য শরীর জুড়ে ছুটে চলা হরমোনের স্রোত, মানুষের বিশেষ করে পুরুষের ডিএনএতে বিবর্তনের ইতিহাস লিখে দিয়ে গেছে। এখন ইন্ডাসট্রিয়াল রেভুলুশনের যুগে, লক্ষ বছরের বিপরীতে মাত্র কয়েক হাজার বছরের ব্যপ্তিতে, ছাপোষা চাকুরেকে খাবারের জন্য শিকার করতে হয় না বা শিকারি প্রাণীর ভয়ে ছুটে পালাতেও হয় না বরং এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং নিপীড়ক রাষ্ট্র তাকে অবদমিত করে যাচ্ছে পদে পদে। কিন্তু শরীরেতো আছেই সেসব কোড। হঠাৎ কারও মধ্যে সেই প্রাচীন সারভাইভাল ইন্সটিংক্ট চালু হয়ে যেতে পারে, আর সেই অবস্থাটাই হচ্ছে আংজায়েটি অ্যাটাক। হঠাৎ কোন ট্রিগার পয়েন্টে আড্রেনেলিন রাস ঘটে যেতে পারে শরীরের ভেতর। বিভিন্ন-বিচিত্র উপায়ে এসব ঘটে। এই গল্পের ছাপোষা চাকুরেও এই প্রাচীন প্রবণতায় আক্রান্ত। কী এক অজানা ঘোর তাকে দিয়ে পাশবিক সব কাজ করার যা কিনা সভ্য-সামাজিক কোন মানুষের জন্য খুবি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে চাকুরে অবাক হয়ে লক্ষ্য করে এতে তার শরীরে পুলক বয়ে যায়, হালকা বোধ হয়। তবে এর থেকে সে মুক্ত হতে পারে না, এই ঘোর তাকে আত্মহত্যা করিয়ে ছাড়ে। এই যে ব্যক্তি মানুষের পরাজয়, তা কীসের বিরুদ্ধে? কার কাছে সে মরে গিয়ে হেরে গেল? ব্যক্তিগত নীতি এবং সামাজিক নৈতিকতার কাছে? নাকি, মানুষের সামগ্রিক ব্যর্থতা, নিজেকে পুর্নাঙ্গরূপে বুঝতে না পারার, সে হিসেবে সমাজকে ঢেলে সাজাবার অক্ষমতার কাছে?

'খাঁচা ও অচিন পাখি' গল্পটিকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এখানে ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের অন্দরমহল এবং বাইরের সমাজ-রাষ্ট্রের সামস্টিকতা

মিলে মিশে একাকার। শরীর একটি প্রাণীর জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয় বিষয়, কারণ এই শরীর দিয়েই সে আশপাশের জগতকে বুঝতে শেখে এবং নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে সজাগ হয়। সবগুলো ইন্দ্রিয়, তা যে একেবারে শরীর সর্বস্ব তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যক্তিমানুষভেদে জগত এই শরীরের সেন্সরেই ধরা পড়ে এবং বিভিন্ন মাত্রায় ব্যক্তির চেতনায় প্রতিফলিত-মুদ্রিত হয়। এখন শরীর কিছু অংশ যদি কোন বিশেষ ঘটনা-দুর্ঘটনায় নাই হয়ে যায় তবে তার প্রভাব ব্যক্তির চেতনায় পড়তে বাধ্য। অদল-বদল ঘটবেই। আর এমন এক পরিস্থিতির সাথে যদি জুড়ে দেয়া যায় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং রাষ্ট্রের নানান কায়দায় অনুষ্ঠিত নিদারুণ মশকরা, তবে হয়তো "খাঁচা এবং অচিন পাখি"র মত একটা গল্প বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যেতে পারে। পাঠক এ গল্পে আবিষ্কার করেন যুদ্ধাহত একজন মুক্তিযোদ্ধা সুলেমানকে, যে কিনা যুদ্ধে মর্টার শেলের আঘাতে চারটি হাত-পায়ের মধ্যে দুটি হাত-পা হারিয়ে এক পুনর্বাসনকেন্দ্রে হুইল চেয়ারে বসে আছে। সুলেমান হয়তো কোন এক কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, তাছাড়া বিদেশী দাতাসংস্থার লোকজনের সামনে বেফাঁস কথা বলে ফেলবার অভ্যাস ছিল সুলেমানের। বলাই বাহুল্য এসব হচ্ছে নিজের ভেতর চেপে থাকা ভীষণ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এই যে ভাঙ্গাচোরা শরীর নিয়ে বেঁচে থাকা, তাতে কি ব্যক্তির চেতনার জগতে কোন রকমফের ঘটে? জগতটা তার কাছে কীভাবে ধরা দেয়? ভাঙ্গাচোরা রেডিওতে স্টেশন ধরতে গেলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয় তার সাথে কি এর কোন মিল আছে? এর পর্দা উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন লেখক। তার সাথে মিলিয়েছেন ঘুণে ধরা রাষ্ট্র ব্যবস্থার জালিয়াতির। কী ভণ্ড এই রাষ্ট্র! যেই রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছেন সুলেমান, সেই পঙ্গু সুলেমানের সাথে তার অর্জিত রাষ্ট্রের কী বীভৎস আচরণ! বিদেশী প্রভুরা আসবার আগে তাকে পরানো হয় ন্যাপথেলেনের সুবাস জরানো পাট খোলা ধপধপে সাদা জামা, সরকারী পাণ্ডারা এসে শাসিয়ে যায়, বিশেষ করে সুলেমানকে, কারণ সে বেফাঁস সব কথা বলে ফেলে। এমনকি নিজের নাম-পরিচয় নিয়ে মশকরা করে মহামান্য অথিতিদের সাথে। এর মধ্যে বিদেশী অতিথিদের দিয়ে যাওয়া নানান দামি উপহার বাইরের দোকানে চালান করে দেয় অফিস সহকারী। এখানে নিম্নবর্গ আবার ফেরেশতারূপে হাজির হয় নি। কারণ রাষ্ট্র এমন একটা অবস্থা কায়েম করে রেখেছে যার ফলশ্রুতিতে খেটে খাওয়া মানুষ তার মূল্যবোধ ঠিক রাখতে পারছে না। তো, এই সমষ্টির মধ্যে লেখক আবিষ্কার করেছেন ব্যক্তি সুলেমানকে। যে তার আহত শরীর নিয়ে বিদঘুটে এক পুনর্বাসনকেন্দ্রে খাবি খায়, তড়পায় তার ভাঙ্গাচোরা শরীরের ভেতর এবং শরীরের সাথে সাথে ভেঙ্গে পড়া বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে।

পুনর্বাসনকেন্দ্রটি যেন একটি খাঁচা, এই খাঁচার ভেতর তার শরীর আরও ভয়াবহ আরেক খাঁচা। সে মুক্তি চায় এই খাঁচা থেকে, তার অতীত থেকে। কিন্তু অতীত বা খাঁচা তাকে ছাড়ে না। এভাবেই কুটিল-জটিল পরিস্থিতে পাঠকের সামনে লেখক উন্মোচন করেন ব্যক্তি সুলেমানকে। যে সুলেমান মুক্তি চায় তার ভাঙ্গাচোরা শরীর থেকে, তার ইচ্ছা হয় কল্পনার অশরীরী হাবিলদার জামালের সাথে জায়গা অদলবদল করে নিতে। শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছাপূরণ হয়। পাট খোলা সাদা ধপধপে জামা সে আবার পরে, ধন্ধে পড়ে আবার কি মহামান্য কোন অতিথির আগমন ঘটছে? না, শেষমেশ টানা-লম্বা-ধপধপে কাপড় তার গায়ে জড়ানো হয়। খাঁচা থেকে মুক্ত হয় অচিন পাখি।

'অপুর ধর্মটিচার' গল্পটি, দুটি বিপ্রতীপ দার্শনিক চিন্তার সংঘর্ষের নিরিখে সবচেয়ে অভিনব। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা ফ্রি উইল বলতে আদৌ কিছু আছে কিনা নাকি মানুষের জীবন এক অতিবৃহৎ এবং মহান কোন কর্ম প্রক্রিয়ার অংশ মাত্র? মানুষ কি এমন জগতের অধিবাসী যেখানে পূর্বপরিকল্পিত কোন মহান কর্মপরিকল্পনা ধাপে ধাপে তার ভাজ খোলে? নাকি আসলেই মানুষের পক্ষে তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ জাহির করার কোন পথ খোলা আছে? এর উত্তর দেয়ার চেষ্টা লেখক করেননি বরং মানুষের এক বিশেষ প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তরুণ সফটওয়্যার ডেভেলপার কামরান ও তার স্ত্রী রিয়া চিন্তায় পড়ে তাদের ছেলে অপুকে নিয়ে, যার একদম গডলেস পরিবেশের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে লাগামছাড়া বেড়ে ওঠার ইতি টানতে তলব পড়ে ধর্ম টিচার/মৌলভির। আর এর হাত ধরেই আমন্ত্রিত হয় মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বিষয়ক কূটাভাস বা প্যারাডক্সেরও। সঙ্গত কারণেই পশ্চিমা যুক্তিবাদী কামরান, স্বপ্ন দেখে-ভাবে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি নিয়ে, মানুষের খেলাধুলা-বইপড়া-বাজার-হাটের ডিজিটাইজেশনের পরে আবেগ-অনুভূতি-শরীরীবোধ, যৌনচাহিদার মত মৌলিক ব্যাপারগুলোর কীভাবে ডিজিটাইজ করা যেতে পারে এমন সব

বিষয়াদি নিয়ে। কামরানের চিন্তায় থাকে কী করে প্রযুক্তি মানুষকে তার শরীরী সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সাইবার স্পেসে আরও মুক্ত-অনায়াস জীবন অভিজ্ঞতা দিতে পারে, মানুষ কী করে ক্রমে হয়ে উঠবে ঈশ্বর। এর মধ্যে অপু তার ধর্ম টিচারের কাছ থেকে জানতে পারে মানুষ আসলে কিছু বানাতে পারে না, কেউ মরতেও পারে না, যতক্ষণ না আসে তার মৃত্যুর হুকুম। কিন্তু গডলেস পরিবেশের স্কুলে পড়া সাত বছরের অপু ধন্ধে পড়ে যায়। তার মনে প্রশ্ন জাগে, সে জানতে চায় তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বলেতে আদৌ কি কিছু আছে? ব্যালকনির খাঁচায় পোষা মুনিয়াকে দেখে ভাবে এইটুকু শরীরের পাখিটার গলায় চাপ দিলে ও কী করতে পারে! অপু দেখতে চায় তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির জোর। একদিন সে ঠিকি গলা চেপে মেরে ফেলে মুনিয়াটাকে। তাতেই সে ক্ষান্ত হয় হয় না, রান্নাঘর থেকে স্টিলের ছুরি এনে মৃত মুনিয়ার গলায় কাটে পোঁচের পর পোঁচ। নিজের ভেতরকার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়ে অপু ঘুমিয়ে যায়। ছেলের এমন কাজ দেখে কামরান হস্তক্ষেপ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না। কীভাবে এই ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করে সে? সে মৃত মুনিয়ার খাঁচাটায় এনে রাখে আরেকটা জীবন্ত মুনিয়া। অপু সকালে ঘুম থেকে উঠে এমন এক চমকপ্রদ ঘটনায় হতবিহব্বল হয়ে পড়ে। কারণ নিজের প্রশ্নের উত্তর সে পেয়ে গেছে। উত্তেজনায় বাবা-মার দরজা ধাক্কায়। সে সকলকে জানিয়ে দিতে চায় তার নতুন পাওয়া উপলব্ধি, তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পরাজয়ের সংবাদ। কিন্তু কামরান এমনটা কেন করলো? এটাই কি মানুষের আদিম-আবহমান প্রবণতা নয়? মানুষ কি শেষমেশ পূর্বনির্ধারিত ভবিতব্যের দিকেই তাকিয়ে শান্তি খুঁজে পায় না? প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের ক্রমশ ঈশ্বর হয়ে ওঠা-চারপাশের পরিবেশের উপর তার প্রবল প্রতিপত্তি, নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ঝাণ্ডা হাতে এগিয়ে যাওয়ার ইঁদুর দৌড়ের বিপরীতে প্রাচীন পূর্বনির্ধারিত ঘটনা প্রবাহ ধারণার প্রতি মানুষের যে প্রবল আকর্ষণ তাকে সে এড়ায় কী করে করে! দার্শনিকেরা বা মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীরা হয়তো এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করতে পারবেন। এখানে খেয়াল করা দরকার যে, গল্পটা লেখা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। তখনও প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে বর্তমানের মত আঁশে আঁশে ভয়াবহ মাত্রায় জড়িয়ে ফেলেনি।

আর গল্পের শেষে লেখকের নিজের জুড়ে দেয়া আরেকটি বিশেষ তথ্য, এটি মিকায়েল [illegible] প্রেরণায় রচিত"। এখন বিশেষ [illegible] থেকে কতোটা ভাষিক এবং দার্শনিক অনুবাদ-রূপান্তর ঘটেছে তা বলা মুশকিল।

আমরা প্রায়ই একজন আরেকজনকে, বিশেষ করে কোন মানুষকে বলে থাকি, "তোমার ব্যথা আমি অনুভব করতে পারছি"। অথবা, "তোমার কষ্ট আমি বুঝি"। এখন কথা হচ্ছে, এসব কি শুধু কথার কথা? সান্ত্বনা? মানুষকে কি একদম শারীরিক অর্থেই অন্যের ব্যথা ছুঁয়ে যায়? নাকি এর মাঝে গভীরতম মানবিক কোন বোধ আসলেই কাজ করে? আধুনিক নিউরোসায়েন্সের কল্যাণে মানুষের মস্তিষ্কের ভেতরকার অন্ধকার-অস্পষ্ট দিকগুলো আস্তে আস্তে আমাদের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে, মানুষের বোঝাপড়ার আওতায় চলে আসছে নানা বিষয়। নিউরোসায়েন্টিস্টরা মিরর নিউরন নামক এক বিচিত্র নিউরনের কথা বলেন। এই নিউরনের কাজই হলো অপরের, আরও পরিষ্কার অর্থে বলতে গেলে আরেকটি জীবিত সত্তার চালচলন পর্যবেক্ষণ করে নিজের নিউরনগুলো সেই রূপে সাজিয়ে নেয়া। ব্যাপারটার একটু ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। ধরুন, আপনি টিভি স্ক্রিনে দেখছেন মেসি বল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে, চার-পাঁচজন রক্ষণভাগ খেলুড়ের দুর্গ চিরে শক্তিশালী শটে বল গিয়ে জালে জড়াল। আপনি ওমনি লাফিয়ে উঠলেন সোফা থেকে। হ্যাঁ, এখানে

আপনি ফুটবল কিছুটা বুঝেন বা খেলতে পারেন বা আদৌ মেসিকে বা আর্জেন্টিনা-বার্সেলোনা ফুটবল দলকে পছন্দ করেন কিনা তার উপর প্রতিক্রিয়ার মাত্রাগত পার্থক্য হয়ে থাকে। তবে যেকোনো কারণেই হোক, আপনি যদি জীবনে কখনো এমনটা অনুভব করে থাকেন, তবে জেনে রাখেবেন এর জন্য দায়ী ছিল মস্তিষ্কের মিরর নিউরন। যার কারণে, মেসি শুধু একা ছুটছিল না, আপনার মস্তিষ্কের ভেতর তার চলাচলের সবটুকই নকল করেছে মিরর নিউরন আর মেসির সাথে সাথে ছুটছিলেন আপনি। অভিজ্ঞতাটা যতটা দূরবর্তী বলে মনে হয়, আদতে ততোটা দূরবর্তী নয়। মানুষের মস্তিষ্ক সেই সাক্ষীই দেয়। ঠিক একই কারণে সাকিব আল হাসানের স্কয়ার ড্রাইভটা শুধু তার একার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, আপনি স্কয়ার ড্রাইভটা হাঁকান। আরও গভীরে গিয়ে বলতে গেলে, প্রাইমেটদের মধ্যে এমন লক্ষণ দেখা যায়। তবে, বিশেষ করে মানুষের মধ্যে মিরর নিউরন আরও বেশি বিকশিত হওয়ার কারণে, হয়তো আমাদের প্রলম্বিত শৈশবের কারণেই, মানুষের মস্তিষ্কে অনুকরণের বোধ অধিক সক্রিয়। একটা শিম্পাঞ্জি শিশুর তার মাকে দেখে দেখে একটা বাদাম ভাঙ্গার কৌশল রপ্ত করতে পাঁচ বছরের মতো সময় লেগে যেতে পারে। অন্যদিকে, মানব শিশু কয়েক মিনিটের পর্যবেক্ষণেই তা অনুকরণ করা শিখে ফেলতে পারে। কিন্তু বোধের দিক থেকে, মিরর নিউরন আরও বেশি জরুরী হয়ে পড়ে যখন আমরা মায়েদের মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করি। গবেষণায় দেখা গেছে, কোন মা কে যখন কান্নারত শিশুর ভিডিও দেখানো হয়, সাথে সাথে তার মস্তিকের বিশেষ অঞ্চল উদ্দীপ্ত হয়ে যায়, আর নিজের সন্তানের কান্নার ভিডিও দেখলে তা আরও বেশি করে উদ্দীপ্ত হয়, মস্তিষ্কের ব্যথা এবং চলাচল সম্পর্কিত সেই বিশেষ অঞ্চলগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে যায়। আসলে মা নিজের অজান্তেই সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তাহলে ভয়ে ভয়ে বলা যায়, কারণ এর পেছনে সাক্ষী সবুদ আরও প্রয়োজন, তবু বলা যায় যে, "আমি তোমার কষ্ট বুঝি" কথাটা বায়বীয় কোন বক্তব্য নয়। বরং এর পেছনে সরাসরি শারীরিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত সত্যতা থাকতে পারে। যদিও, বিভিন্ন-বিচিত্র কার্যকারণের বিভিন্নতায় অনুভবের মাত্রা বিভিন্ন হতে পারে। আসল কথায় এবার আসা যাক। মস্তিষ্ক সম্পর্কে এতসব কথা বলাটা আসলে ধান ভানতে শিবের গীত। "ছোঁয়া" গল্পটাকে বশে আনার চেষ্টা। কোন বিকেলে রানু এলাকার পরিব্রাজক বিড়াটিকে দেখছিল। বিড়াল তার স্বভাবসিদ্ধ এলেবেলেমির মধ্যে তিন তলার কার্নিশ থেকে নিচে পড়ে যায়। ব্যাথা পায় ঠিকি কিন্তু মরে না। তবু চমকানোর মতোই দৃশ্য। কাচবন্ধ জানালার ওপার থেকে দৃশ্যটা দেখে রানু বুকে হাত চাপে। ধকধক হৃৎপিণ্ডের আওয়াজটা তার নিজের না বিড়ালের ভাবতে ভাবতে সরাসরি চোখ রাখে বিড়ালটার চোখে। কয়েক সেকেন্ড এমন তাকিয়ে থেকে তার মনে হয় বিড়ালটাও বুঝি রানুর হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ অবিকল শুনতে পাচ্ছে। এরপরই ঘটে যায় আজগুবি এক ঘটনা। ধীরে সুস্থে রানুর মানবী শরীর পরিণত হয় কালো রোমশ এক বিড়ালের শরীরে। ব্যাপারটা রানু বুঝলেও তার আশপাশের কেউ টের পায় না। সবাই তার সাথে মানুষ রানুর মতোই ব্যবহার করতে থাকে, যেন কিচ্ছুটি বদলায়নি। এর মধ্যে রানু ভেবে ভেবে থৈ পায় না। এক সময়, কার্নিশ থেকে খসে পড়া বিড়ালটার সাথে তার কথা হয়। কথা নয় ঠিক, বরং বিড়ালটা উপদেশ দিয়ে তাকে বিড়াল জীবন থেকে মুক্ত করে যায়। সতর্ক করে দিয়ে যায়, আর রানুও বুঝতে পারে, "বুকে হাত চাপলে ক্ষতি

পড়ছে, ওলটপালট, লণ্ডভণ্ড হচ্ছে। কুছ্ পরোয়া নেহি। কেবল ...” । বিড়ালের জবানীতে লেখক আমাদের সকলকেই সতর্ক করে দিচ্ছেন। দেখো, তবে মস্তিষ্কের মিরর নিউরনের জোরে অন্যকে ছুঁয়ে যেও না। মানবিক বোধের সর্বশ্চোটা ছুঁতে যেও না। ছুঁয়ে গেলে অনেক বিপদ। রোহিঙ্গা নরনারীকে দেখে, তাদের ছুঁয়ে গেলে রোহিঙ্গা হয়ে যাওয়ার বিপদ। আলগোছে তাকাও, দেখো, তবে কেবল ছুঁয়ে যেও না।